বিশ্বনবী প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের আদর্শ

(বাংলা-bengali-البنغالية)

সিরাজুল ইসলাম আলী আকবর

1431هـ - 2010م

islamhouse.com

﴿الأسوة النبوية في الحكومة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم﴾

(باللغة البنغالية)

سراج الإسلام علي أكبر

2010 - 1431

islamhouse.com

বিশ্বনবী প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের আদর্শ

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশে কোনো সুসংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা কার্যকর ছিলনা। গোটা আরব ছিল কতিপয় বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠি বা গোত্রের সমষ্টি । এদের পরস্পরের মধ্যে কোনো সমন্বয় সূত্র ছিলনা। প্রতিটি গোত্র নিজস্ব রসম রেওয়াজের অনুসারী ছিল। আর তার উপর চলত গোত্রপতিদের আদেশ-নিষেধের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য। কোনো গোত্রই অপর কোনো গোত্রের কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির অধীনতা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। গোত্রপতিদের প্রাধান্যও খুব বেশি প্রভাবশালী হত না। মূলত তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই ছিল স্বেচ্ছাচারী। চারিদিকে হত্যাকাণ্ড, মারামারি ও লুটতরাজ চলত অবাধে। শক্তিমান ব্যক্তি নিজেকে দুর্বলদের অধিকার হরণ করা ও তাদের উপর অত্যাচার চালানোর নিরঙ্কুশ অধিকারী বলে মনে করত। কিন্তু দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সমগ্র আরব দেশে গোত্রীয় অনৈক্য ও পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে যায়। শত শত বছর পূর্ব থেকে চলে আসা এই বিপর্যস্ত অবস্থাকে একটি সুসজ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্রব্যাবস্থার মাধ্যেমেই সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনা সম্ভবপর হয়েছিল। তখন সমগ্র আরব জনতাকে একটি মহান আদর্শিক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে দেওয়া হয়েছিল। আর তা সম্ভবপর হয়েছিল কেবলমাত্র এই জন্য যে, সমগ্র আরব জনগণ ইসলাম গ্রহণ করে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজেদের সর্বোচ্চ নেতা ও প্রশাসক রূপে মেনে নিয়েছিল।

বস্তুত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আল্লাহ তা'য়ালার সর্বশেষ রাসূল। দ্বীন-ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর দায়িত্ব। আর দ্বীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তেতে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে আল্লাহর দ্বীনই হবে একমাত্র বুনিয়াদি আদর্শ এবং আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাত হবে আইনের একমাত্র উৎস। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশাতেই আরবের বুকে তেমন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর জীবন সাধনার চূড়ান্ত সাফল্য এখানেই নিহিত।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনকালেই আরবের প্রতিটি অঞ্চল এই রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে এসে গিয়েছিল। আরবদেশের প্বার্শবর্তী বেশ কয়েকটি অঞ্চলও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর আনুগত্য স্বীকার করে মদীনা রাষ্ট্রের অধীনতা মেনে নিয়েছিল।

১। যেসব অঞ্চল মদিনা রাষ্ট্রের আওতাধীন হয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব অঞ্চলে নিজের পক্ষ থেকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন সাহাবি ইতাব ইবনে উসাইদ(রা)। হিজাজ ও নজদ এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২। যেসব এলাকা সন্ধির মাধ্যমে মদিনা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেসব এলাকায় ইসলামের পূর্বে বিভিন্ন ধরনের রাজতন্ত্র ও স্থানীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব রাজা ও আমীরকে পদচ্যুত করার পরিবর্তে তাদেরকে স্ব স্ব পদে বহাল রেখেছিলেন। কেননা দেশ দখল করাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য ছিলনা। স্থানীয় প্রশাসকের হাত থেকে কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়ে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করাও ছিলনা তার প্রধান লক্ষ্য, বরং মানবতাকে মাখলূকের দাসত্ব মুক্ত করে একমাত্র মহান আল্লাহর বান্দা বানানোই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন দুনিয়াতে। সুতরাং সাম্রাজ্য বিস্তার করাই তাঁর কোনো লক্ষ্য ছিল না। এ কারণে যেসব দেশের রাজা- বাদশাহ ও স্থানীয় শাসনকর্তা দ্বীন ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাদের হাতেই তিনি তাদের কর্তৃত্ব-এলাকার শাসন ভার অর্পণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, যেসব স্থানীয় প্রশাসক দ্বীন ইসলাম কবুল না করেও ইসলামি রাষ্ট্রকে জিযিয়া-কর দিতে সম্মত হয়েছিলেন, সেই সব এলাকার কর্তৃত্বও তিনি তাদের হাতেই থাকতে দিয়েছিলেন। এদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ ব্যতীত অন্য কিছুর দাবী কখনই করা হয়নি।

এই অঞ্চলগুলো নিম্নলিখিত প্রদেশ ও স্থানীয় কর্তৃত্বে বিভক্ত ছিলঃ

১। বাইরাইন – এখানকার প্রশাসক ছিলেন মুসলিম। তার নাম ছিল মুনযির ইবনে মাভী।

২। আম্মান –এখানকার প্রশাসক ও পরিচালক ছিলেন দুই ভাই। এদের একজনের নাম ছিল জায়ফর আর অপরজনের নাম আরফ। এরা দু'জনেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

৩। তাইমা – স্থানীয় রাষ্ট্র। এর শাসনকর্তা ছিল একজন ইয়াহুদি।
৪। আয়লা – স্থানীয় রাষ্ট্র। এখানকার প্রশাসক ছিলেন একজন খৃষ্টান।
৫। দওমাতুল জান্দাল – স্থানীয় রাষ্ট্র। এখানকার প্রশাসনেও একজন খৃষ্টান নিযুক্ত ছিলেন।
৬। নাজরান – স্থানীয় প্রশাসন। এটাও খৃষ্টধর্মালম্বী ছিল।
৭। ইয়ামেন – এই প্রদেশটি বিভিন্ন স্থানীয় প্রশাসনে বিভক্ত ছিল। এসবের অধিকাংশ প্রশাসক ছিলেন হিময়ারি। তারা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থাপিত দ্বীন কবুলের আহবানে মুসলমান হয়েছিলেন। সানার শাসনকর্তা বাযান ইবনে সাসান পারসিক ছিলেন। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

রাসূলের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের আদর্শিক ব্যবস্থাঃ

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়কালে নিম্নলিখিত ধর্মসমূহ প্রচলিত ছিলঃ

১। দ্বীন ইসলাম। তা ছিল এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আদর্শ। দেশের অধিকাংশ আদীবাসিই ছিল মুসলমান। আর সংখ্যাগুরু অধিবাসীদের জীবন আদর্শই যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হওয়া স্বাভাবিক, তাতে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। কেননা প্রশাসনের নিয়ম শৃঙ্খলা পরিচালনের দায়িত্ব প্রধানত তাদের উপরই অর্পিত হয়ে থাকে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সংকট বা তার উপর হুমকি দেখা দিলে সংখ্যাগুরু জনতাই তখন নিজেদের ধন-মাল ও জান-প্রাণ কুরবান করার জন্য প্রস্তুত থাকে। কেননা দেশের স্বাধীনতাই তাদের স্বাধীনতা। তাদের নিজেদের স্বাধীনতা দেশের স্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় সংখ্যাগুরু জনতার স্বকীয় জীবনাদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়ন যেমন ন্যায়সঙ্গত শাসন ব্যবস্থা হতে পারে, তেমনি সংকটকালে তাদের নিকট থেকে জানমালের কুরবানি পেতে হলে তাদের জীবনাদর্শকে পূর্ণ বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করা একান্তই অপরিহার্য। অন্যথায় দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কিছুতেই রক্ষা পেতে পারে না।
২। ইয়াহুদি ধর্মমত। দক্ষিনে ইয়ামেন ও উত্তরে সিরিয়ায় এই ধর্মালম্বী জনতা বাস করত।
৩। খৃষ্ট ধর্মমত। এই ধর্মে বিশ্বাসী লোকদেরও অধিকাংশ বাস করত ইয়ামেন ও সিরিয়ায়।
৪। অগ্নিউপাসনার ধর্ম। এই ধর্মের লোক প্রধানত বাহরাইনে বাস করত। শেষোক্ত তিন ধর্মালম্বী লোকদের প্রতি ইসলামি রাষ্ট্রে পূর্ণ সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার আচরণ প্রদর্শন করা হত। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ যেসব অধিকার ও সুবিধাদি ভোগ করতেন, তাদের জন্যও ছিল সেই সব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা। অনুরূপভাবে তাদের উপর দায়দায়িত্ব ঠিক সেইরূপ অর্পিত ছিল, যা ছিল সংখ্যাগুরু মুসলিম জনতার উপর। বস্তুত: অধিবাসি জনগনের মধ্যে এমন এক মহত্তর সাম্য ও নিরপেক্ষ ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত ছিল, যার কোনো দৃষ্টান্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে না। দুনিয়ার সূচনা হতে নিয়ে অদ্যাবধি অপর কোনো আদর্শ বা ধর্মমত অনুরূপ দৃষ্টান্তের একশ ভাগের একভাগও উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি, হবেওনা ভবিষ্যতে। বস্তুত মুসলিম জনগণ অমুসলিম নাগরিকদেরকে ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞান করতেন। কথা বা কাজ যে কোনো দিক দিয়ে তাদের সাথে কোনোরূপ কষ্টদায়ক আচরণ করাকে তারা সম্পূর্ণ হারাম মনে করতেন। তাদের মতে, এ ধরনের আচরণে তাদের মানসিক কষ্টবোধের আশঙ্কা আছে। সূরা ''মুমতাহিনার'' নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটিই ছিল এ ক্ষেত্রে তাদের দিকদর্শনঃ

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿8﴾

দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘড় থেকে বের করে দেয়নি তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না।নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।

(সূরা মুমতাহিনাঃ ৮)

ইসলাম এসব ধর্মালম্বীদের আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল। তারা নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি কোনো প্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতা ব্যতীতই যথাযথভাবে পালন করতে পারত; নিজেদের মত বিশ্বাসের প্রকাশ ও প্রচার করার অবাধ সুযোগও পেত। তাদের নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদসমূহ নিজেদের ধর্ম বিধানের ভিত্তেতে মীমাংসা করে নেওয়ার অধিকারী ছিল। সাধারণ, রাষ্ট্রীয় ও সামষ্টিক ব্যাপারে তারা রাষ্ট্রের একজন

সাধারণ নাগরিকের মতই নিরপেক্ষ আচরণ লাভ করত। কেননা তারাও ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মুসলিম নাগরিকদের ন্যায়ই অভিন্ন সম্মান ও মর্যাদা লাভের অধিকারী ছিল। তাদেরও মৌলিক অধিকার ছিল তাই, যা ছিল একজন মুসলিম নাগরিকের। তাদের উপর সেই সব দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হত, যা হত মুসলমানদের উপর।

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের নিকট থেকে জিযিয়া নামক এক ধরনের বিশেষ কর ব্যতীত আর কিছুই দাবী করা হত না। এই জিযিয়া দান কোনো ক্রমেই কোনো অপমানকর ব্যবস্থা ছিল না। তাদের সঠিক সংরক্ষণ, অধিকার আদায় ও নিরাপত্তা বিধানের যে দায়িত্ব ইসলামি রাষ্ট্রকে বহন ও পালন করতে হত ,তারই বিনিময় স্বরূপ তাদের নিকট হতে এই খাতের অর্থ গ্রহণ করা হত। জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করার দায়িত্ব সব সময়ই সরকারের উপর ন্যাস্ত থাকত।

মুসলমানদের উপর জিযিয়া ধরনের কোনো কর ধার্য হত না বটে, কিন্তু তার পরিবর্তে তাদের নিকট হতে গ্রহণ করা হত যাকাত। অমুসলিম নাগরিকদের যাকাত দিতে হত না। অবশ্য জিযিয়া ও যাকাতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। জিযিয়া একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ধার্য হয়, যাকাতের পরিমাণ অনির্দিষ্ট। কেননা যাকাতযোগ্য অধিক পরিমাণ সম্পদের মালিকদের নিকট থেকে অধিক পরিমাণে যাকাত আদায় করা হবে, এটাই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, মুসলমানগণ যাকাত ছাড়াও সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে আরও নানা খাতে অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য থাকত; অমুসলিমদের জন্য এই বাধ্যবাধকতা ছিল না।

যাকাত ও জিযিয়ার মধ্যকার আরও একটি পার্থক্য তা হচ্ছে, যাকাত বাবদ প্রাপ্ত সম্পদের বেশিরভাগ গরীব ও মিসকীনদের জন্য ব্যয় করতে হয়, জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয় তার খুব কম অংশ। আর জিযিয়া সম্পূর্ণভাবে ব্যয় করা হয় সাধারণত: জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে । 'যাকাত' শব্দের অর্থ কোনো জিনিসের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা বিধান ও প্রবৃদ্ধি সাধন। যাকাত প্রদান করলে অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র ও হালাল হয় ও প্রবৃদ্ধি লাভ করে। এটি ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। এর নাম যাকাত রাখা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, আর্থিক প্রয়োজন পূরণের যে দায়িত্ব রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনগণের উপর অর্পন করা হয় এবং প্রশাসন ও উন্নয়নের জন্য যেসব অর্থ দেশের সাধারণ নাগরিকদের নিকট থেকে আদায় করা হয়, তা থেকে এই সম্পদ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থায় রাখতে হবে। এটি মুসলমানদের দ্বীনি কর্তব্যভুক্ত। তা কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যথারীতি আদায় করতে হবে। আদায় করার কর্তব্য এড়িয়ে যেতে কোনো ঈমানদার মুসলমানই চেষ্টা করবে না- কোনোরূপ অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করবে না। যাকাত নারী-পুরুষ-শিশু সর্ব পর্যায়ের লোকদের নিকট থেকেই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু জিযিয়া এরূপ নয়।

এ পর্যায়ে স্মরণ রাখতে হবে, ইসলামি রাষ্ট্র মানেই অমুসলিম নাগরিকদের নিকট থেকে জিযিয়া নামক কর অবশ্য অবশ্যই আদায় করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কোনো অমুসলিম দেশ যুদ্ধ করে জয় করার পর দখলে রাখা হলে সেখানে যারা দ্বীন ইসলাম কবুল করবে না, অমুসলিম থাকতে চাইবে, জিযিয়া কেবল তাদের নিকট থেকেই গ্রহণ করা হবে-এই করের অন্য কোনো নাম করণ করাতেও কোনো বাধা নেই। কুরআনে এ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, তার সারমর্ম হল-ইসলামি রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে তার স্মারক স্বরূপ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ রাষ্ট্রের ধনভান্ডারে নিয়মিত দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে, অন্য কিছু নয়। অমুসলিম নাগরিকগণ যদি জিযিয়া না দিয়ে সাধারণ পর্যায়ের একটা কর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে ইসলামি রাষ্ট্র তাদের থেকে তা-ই গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় খলিফা উমর ফারুক (রা) এর খিলাফত আমলে 'বনু তাগলুব' গোত্রের খৃষ্টান জনগণ আবেদন জানিয়েছিল, তাদের জিযিয়া দিতে বাধ্য না করে 'সাদকা' নামে দ্বিগুণ অর্থ তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হোক। খলিফা তাদের নিকট থেকে তাই সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন।

দ্বীন ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতার যে অনির্বচনীয় অধিকার ও সুযোগ সুবিধা দিয়েছে, তা তার পক্ষে বিরাট গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নেই। ইসলামি রাষ্ট্রে তারা সর্বাত্মক নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারে । তাদের ধর্মমত পরিবর্তন বা ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করার কোনো অধিকারই ইসলাম কাউকে দেয়নি। তাদের সম্মানার্হ ধর্মীয়নেতাদের গালাগাল করে তাদের মনে কোনোরূপ কষ্টদানের সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে ইসলাম তাদের এই অধিকার দিয়েছে যে, তারা শালীনতার সর্বজনবিদিত সীমার মধ্য থেকে সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের সাথে তর্ক বিতর্কেও লিপ্ত হতে পারে। কুরআন মজীদে মুসলমানদের এই পর্যায়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছেঃ

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿46﴾

আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করোনা। তবে তাদের মধ্যে ওরা ছাড়া যারা জুলুম করেছে আর তোমরা বল আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহও একই আর আমরা তারই সমীপে আত্মসমর্পণ করি।

(সুরা আল আনকাবুতঃ ৪৬)

বস্তুত কোরআন মজীদে এমন অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যাতে অমুসলিমদের সাথে ভাল ব্যবহার করার ও তাদের প্রতি সুবিচার করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সম্বোধন করেই বলা হয়েছেঃ

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿34﴾

আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না, মন্দকে প্রতিহত কর তা দ্বারা যা উৎকৃষ্টতর, ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে যেন হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

(সূরা হা-মীম আস্-সীজদাহঃ ৩৪)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ইয়াহুদি, নাসারা ও অগ্নিপূজক ছাড়াও মুনাফিকদের একটা শ্রেণী বর্তমান ছিল। তারা অন্তরে ও মনে কুফরের প্রতি অবিচল থাকলেও মুখে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ করত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাহ্যিক আচরণকেই গ্রহণ করেছিলেন আর প্রকৃত ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে এদেরকে রাষ্ট্রপরিচালনায় সুযোগদানের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদেই তাদের নিয়োগ করেননি। তাদের প্রতি কখনও বিশ্বাস স্থাপন করেন নি - আস্থা বা নির্ভরতাও প্রকাশ করেন নি।

ইসলামি রাষ্ট্রে বিদেশী নাগরিকঃ

ইসলামি রাষ্ট্রে আরব ছাড়াও ইরানি ,রোমক, আবিসীনিয় এবং ইয়াহুদিরা বসবাস করত। তাদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। তাদের খুব কম সংখ্যাক লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইরানিদের মধ্য থেকে সালমান ফারসী এবং ইয়ামেনে বসবাসকারী আবনা নামে পরিচিত কিছু সংখ্যক ইরানি ইসলাম কবুল করেছিলেন।

ইসলাম এই সব লোকের সাথে পূর্ণ সাম্যের নীতি ও আচরণ প্রদর্শন করেছে। আরবগণ সংখ্যাগুরু হওয়া সত্বেও বহিরাগত এইসব মুসলমানদের উপর কোনোরূপ শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য ছিল না। শুধু তাই নয়, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে কে দেশি, কে বিদেশি- কে স্থানীয়, কে বহিরাগত, কে দেশ মাতৃকার আর কে তা নয়, এ পার্থক্য কোনো দিনই করা হয়নি। কেননা নবী করীমসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্বমানবতার হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কেবলমাত্র আরবদের নিকট সত্য দ্বীনের দাওয়াত দেয়াই তার দায়িত্ব ছিল না। দল মত গোত্র বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকেই দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেয়া ছিল তাঁর প্রধান কর্তব্য। ফলে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অতি স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত মুসলমানকে সমান ও অভিন্ন মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হল। এই সমাজে মর্যাদাগত অবস্থান পার্থক্যের একটি মাত্র মানদন্ডই স্বীকৃত ছিল, আর তা হচ্ছে -তাকওয়া ও আল্লাহভীরুতা। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে এ কথাই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿13﴾

হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ সম্যক অবহিত।

(আল হুজুরাতঃ ১৩)

স্বয়ং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেনঃ
মুসলমানদের সকলে চিরুনীর কাটাসমূহের মত সমান। কোনো আরবের অনারবের উপর এবং কোনো অনারবের আরবের উপর তাকওয়া ভিন্ন অন্য কোনো দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মূলনীতিঃ

ইসলামি রাষ্ট্রের মৌল দৃষ্টিকোণ হচ্ছে, ধর্ম বর্ণ বংশ গোত্র ও জাতীয়তা নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে কাজ করা, পূর্ণ ন্যায় পরায়ণতার সাথে সমস্ত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা, সকলের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সুবিচার প্রদর্শন করা।

বর্তমান কালের সুসভ্য ও বড় বড় সংস্কৃতিবান জাতিসমূহ নিজদেরকে মানবতার একমাত্র বন্ধু বলে দাবি করছে। অথচ এদের সকলেরই রাষ্ট্রনীতি সংকীর্ণ জাতীয়তা ও দেশ মাতৃকা ভিত্তিক। তাদের সামনে রয়েছে নিজেদের স্বমতের ও স্বদেশী লোকদের কল্যাণ, নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য নয়। এসব জাতি বা রাষ্ট্র অন্য মানুষের কোনো সাহায্য যদি কখনও করেও, তবে তা একান্ত নিজ স্বার্থে। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের দোহাই তারা দেয় শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, দুর্বল পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠি ও জাতিসমূহকে যেন ধোকা দিয়ে নিজের দাসত্ব নিগড়ে বন্দী করতে পারে; যেন প্রয়োজনের সময় এসব জাতির লোকেরা তাদের জন্য যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়।

কিন্তু নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থাপিত আদর্শ দ্বীন ইসলামে কোনোরূপ ধোকা ও প্রতারণার অবকাশ নেই। এই দ্বীন কোনো জাতি বা অঞ্চলের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাবার অনুমতিও কাউকে দেয়া না। অপর কোনো দেশের শস্য শ্যামল উর্বরা ভূমি বা মূল্যবান খনিজ সম্পদ অথবা ঐশ্বর্য্য-বিত্ত-বৈভবের প্রতি কোনো লোভই মুসলমানদের থাকতে পারে না। ইসলামের লক্ষ্য বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও হেদায়াত । ইসলামের দৃষ্টিতে এই কল্যাণ ও হেদায়াত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিংবা বলা যায় প্রত্যেকটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। কল্যাণ পেতে হলে হেদায়াত গ্রহণ করতে হবে আর হেদায়াত গ্রহণ করলেই কল্যাণ লাভ সম্ভব। হেদায়াত গ্রহণ ছাড়া যে কল্যাণ, ইসলামের দৃষ্টিতে তা ধ্বংসের নামান্তর।

ইসলামি রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্যে পরিপূর্ণ সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা ও পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। জাতীয়তা ও ভাষার দৃষ্টিতে সেখানে নাগরিকদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য সৃষ্টির বিন্দু পরিমাণ সুযোগ নেই। এই রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে অনারব তেমনই সম্মানার্হ, যেমন আরব। নিগ্রো ও কৃষ্ণাঙ্গের সেই রূপ অধিকার স্বীকৃত যেমন স্বীকৃত শ্বেতাঙ্গের। বস্তুত ইসলাম একটা দ্বীন ও আদর্শিক আন্দোলন বিশেষ। তা জাতীয়তাবাদী বা ভাষাভিত্তিক আন্দোলন নয়। এ ধরনের বিতর্কের সাথে ইসলামের কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই।

এ নীতির কারণে ইসলামি রাষ্ট্রে আরবদের ছাড়া অন্যান্য জাতির লোকেরাও বড় বড় রাষ্ট্রীয় পদে অভিষিক্ত হতে পারতেন। তাদের আনুগত্য করা নির্বিশেষে সকল নাগরিকদের জন্য কর্তব্য ছিল। সে লোক কোনো পশ্চাদপদ বা অবহেলিত জাতির মধ্য থেকে আগত হলেও তাতে কোনোরূপ দ্বিধা সংকোচ করা চলত না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তব কর্মের মাধ্যমেই এই আদর্শকে ভাস্বর করে তুলেছিলেন। সাহাবি সালমান (রা) একজন ইরানি (পারস্য দেশীয়) ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু সমাজে তিনি অতীব সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত ছিলেন। সুহাইব রুমীও ছিলেন একজন ক্রিতদাস। কিন্তু কি যুদ্ধ কি সন্ধি, কোনো অবস্থায়ই তাঁর সাথে পরামর্শ না করে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন না। হাবশি গোলাম বিলাল ইবনে রবাহ সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। ইসলামি রাষ্ট্রে তিনি কেবল মসজিদের মুয়াজ্জিনই ছিলেন না, তিনি ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের কোষাধ্যক্ষ। আধুনিক পরিভাষায় বলতে গেলে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

এরূপ সুমহান ও অতুলনীয় সাম্যের আদর্শ দুনিয়ায় আর কেউ প্রতিষ্ঠিত করেছে কি?

বিশ্বনবীর সার্বজনীনতা

দ্বীন ইসলাম নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থাপিত দ্বীন। তাঁর এই দ্বীনের দাওয়াতের বহু সংখ্যক দিক রয়েছে। বিস্তীর্ণ এর দিক ও আয়তন। এর গভীরতা অতলস্পর্শ। সে বিষয়ে কথা বলার ও আলোচনা করার অনেক দিক ও ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও আপাতত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতের একটি মাত্র দিক সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যেই সীমিত থাকতে চাই এবং সেই একটি দিকের উপরই সমগ্র লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখতে ইচ্ছা করেছি। সেই দিকটি হল, তাঁর দাওয়াতের ব্যাপকতা ও বিশ্বজনীনতা। কুরআন মজীদেও এ বিষয়টির উপর গুরত্ব আরোপিত হয়েছে।

আমরা কুরআনের বিশাল বিস্তীর্ণ পরিমন্ডলে দাঁড়িয়ে তার বিশ্বকেন্দ্রিক ঘোষণাবলী শুনতে পাচ্ছি, যদিও তার নাযিল হওয়ার সময়কাল থেকে আমরা অনেক দূরে পৌঁছে গেছি। কুরআন উদাত্ত কণ্ঠে ও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছে, ইসলাম মৌলিকভাবে একটি বিশ্বাস – একটি প্রত্যয়। সে বিশ্বাস ও প্রত্যয় কোনো বিশেষ সময়, সমাজ বা জনসমষ্টির জন্য নির্দিষ্ট নয়। বিশেষ কোনো শহর, নগর বা দেশের জন্য একান্তভাবে নির্দেশিত নয়। দ্বীন ইসলাম পূর্ণাঙ্গ বিধান হিসেবে সকল ব্যক্তি ও সমষ্টির জন্য- জাতি, দেশ, কাল, বর্ণ ও ভাষার দিক দিয়ে তাদের মধ্যে যত পার্থক্যই থাক না কেন, মানব বংশের সকল পর্যায়ে তা বাস্তবায়িত হওয়ার যোগ্য। কোনো প্রতিবন্ধকতাই এ পথ আগলে দাঁড়াতে পারে না। জাতীয়তা ও আঞ্চলিকতার প্রতিবন্ধকতাও তথায় স্বীকৃত হতে পারে না। বিশ্ব নবীর দাওয়াত ও আন্দোলনের ইতিহাস এবং তার বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণের ইতিবৃত্তই এর অকাট্য প্রমাণ।

আমরা যখনই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থাপিত দ্বীনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করি, তখন আমাদের চোখের সামনে থেকে অন্ধকারের কুহেলিকা বিলীন হয়ে যায়। কোনোরূপ চেষ্টা বা কষ্ট ছাড়াই আমরা সবকিছু স্পষ্টভাবে দেখতে পাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীনী দাওয়াতের সূচনা পর্ব তাঁর বংশ ও পরিবার পরিমন্ডলের মধ্যেই আবর্তিত হয়েছিল। কেননা আল্লাহই তাকে সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন, ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿214

আর তুমি তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক কর।

(সূরা শু আরাঃ ২১৪)

এই নির্দেশের তাৎপর্য খুবই গুরুত্ববহ। আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দূরবর্তী অনাত্মীয় ও রক্ত সম্পর্কের কিংবা বংশের লোকদের থেকে অধিক আনুকূল্য পাওয়ার সম্ভাবনাকে কোনো ক্রমেই উপেক্ষা করা চলে না। বিশেষ করে গোত্র কেন্দ্রিক সমাজ জীবনের সেই সংঘাতময় পরিস্থিতিতে বংশ ও রক্ত সম্পর্কের নৈকট্য বোধের ভাবধারায় এই আনুকূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দ্বীনী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ের সুদীর্ঘ তিনটি বছরকাল পূর্ণ গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন। এই সময় তিনি যতটা সম্ভব অপ্রকাশ্যভাবে আপন ও নিকটবর্তী লোকদেরকেই ঈমান গ্রহণের আহবান জানাতে থাকেন। সেক্ষেত্রেও তিনি কখনও ইশারা-ইঙ্গিত আবার কখনো সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর এই দাওয়াতের সাধারণত্ব বা বিশ্বজনীনতাকে লোকদের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরতেন। তিনি বলতে চাইতেন, তাঁর দ্বীন ও শরিয়ত বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট নয়, তা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের জন্য, নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য ও অনুসরনীয় যেমন, তেমনি সকলের জন্য কল্যাণকরও। এই মুহূর্তে বিশেষ একটা পরিবেষ্টনীর মধ্যে সীমিত হলেও অচিরেই তা সর্বসাধারণ্যে পরিব্যাপ্ত ও পরিব্যক্ত হয়ে পড়বে। তখন তা কোনো নির্দিষ্ট বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ঘরে আপন চাচা-মামা পর্যায়ের ব্যক্তিদের একত্রিত করে সর্বপ্রথম যে দাওয়াত পেশ করেন, প্রামাণ্য ইতিহাসে তা নিম্নোক্ত ভাষায় উদ্ধৃত রয়েছেঃ

যে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই তার নামে শপথ করে বলছি, আমি আল্লাহর রাসূলরূপে প্রেরিত ও নিয়োজিত হয়েছি বিশেষভাবে তোমাদের জন্য এবং সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের জন্য । আল্লাহর নামে শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে, যেমন করে তোমরা নিদ্রা থেকে জেগে উঠ। তখন তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব গ্রহণ করা হবে। সেই সাথে এ-ও জানবে যে, জান্নাত চিরন্তন, জাহান্নামও চিরস্থায়ী। অত:পর তিনি কিছু সময়ের অবকাশ পেয়ে যান। এই সময়ে তিনি তাঁর দাওয়াতের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। তখন তিনি তাঁর প্রতি অর্পিত দাওয়াতের দায়িত্বের কথা সকলের সম্মুখে প্রকাশ করে দেওয়ার নির্দেশ পান। সে নির্দেশের ভাষা ছিল এইঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿94﴾

সুতরাং তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তা ব্যাপকভাবে প্রসার কর। এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।

(সূরা হিজরঃ ৯৪)

এই নির্দেশ পেয়ে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ''সাফা'' পর্বতের শিখরে আরোহণ করেন এবং উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ দিতে থাকেনঃ ইয়া সাবাহাহ! (হে প্রাতঃকালীন জনতা!) আওয়াজ শুনে নিয়ম অনুযায়ী মক্কার জনতা পর্বতের পাদদেশে এসে সমবেত হয়। তাদের সম্বোধন করে তিনি বললেনঃ '' আমি যদি তোমাদের বলি, এই পাহাড়ের অপর পাশে শত্রুপক্ষের একদল অশ্বারোহী দাঁড়িয়ে আছে, এখনই তারা তোমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে, তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে না? উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলে উঠলঃ ''আমরা আজ পর্যন্ত তোমার মুখে মিথ্যা শুনতে পাইনি, তোমার ব্যাপারে এর কোনো অভিজ্ঞতাই আমাদের নেই''।

হে কুরাইশ বংশের লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। আল্লাহ থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমি কিছুই করতে পারবনা- কোনো কাজেই আসব না। আমিতো কঠিন আযাব আসার আগে-ভাগে তোমাদের কে সুস্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী মাত্র। আমার ও তোমাদের ব্যাপারকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাতে চাইলে মনে করঃ এক ব্যাক্তি শত্রু বাহিনী দেখতে পেল, সে তার আপনজনদেরকে সে বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়ার ইচ্ছা করল। কিন্তু ভয় পেল, শত্রুরা তার আগেই তার আপনজনদের উপর আক্রমণ করে বসে নাকি। তখন নিরুপায় হয়ে চিৎকার দিতে লাগল, হে সকাল বেলার জনগণ! সাবধান হয়ে যাও, নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে।

এভাবেই ইসলামি দাওয়াতের সূচনা হয়েছিল। বলা যায়, হাটি হাটি পা পা করেই তা অগ্রসর হচ্ছিল। চতুর্দিকে সমাচ্ছন্ন শিরক ও নাস্তিকতার আবরণ ছিন্ন করেই অতি ধীরে ধীরে তাকে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। এ সময়েই মক্কা নগরীর কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব দ্বীন-ইসলাম গ্রহণ করলেন। বহু সংখ্যক যুবকও তাঁর দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। সেই সাথে কুরাইশ সরদাররাও উৎকর্ণ হয়ে উঠে। অবস্থা দেখে তারা অনেকটা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কেমন করে এই আওয়াজ নিস্তব্ধ করা যায়, সে চিন্তায় তারা খুবই কাতর হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত তারা এই আওয়াজকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই সম্পূর্ণরূপে খতম করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এজন্যে তারা প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে যুবক নিয়ে একটি ঘাতক দল গঠন করে এবং তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা একসাথে একই ব্যক্তির ন্যায় আঘাত হানবে, যেন তিনি শেষ হয়ে যান। তাহলে তাঁর গোত্র বনু হাশেম বিশেষ কারোর বিরুদ্ধে রক্ত মূল্যের দাবী করার সাহস পাবে না। সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাও সম্ভব হবে না তাদের পক্ষে। এভাবে কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে; কিন্তু সে জন্যে কাউকেই কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না- সমাজের নিকটও দায়ী হতে হবে না।

কিন্তু আল্লাহ তাআলাই তাদের এই ষড়যন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দিলেন। তিনি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদিনার উদ্দেশে মক্কা ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন।

রাসূলে করীমসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় উপস্থিত হলে সেখানকার আদিবাসী আওস ও খাযরাজ বংশের লোকেরা তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন, তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য, সমর্থন ও সহযোগীতা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন; তাঁর প্রতিরক্ষায় সর্বাত্মক শক্তি ব্যয়ের জন্য ওয়াদাবদ্ধ হলেন, যেমন এর পূর্বে মক্কায় তারা বায়আত গ্রহণ করেছিলেন।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা নগরী এবং নিজ বংশের লোকদের ত্যাগ করে চলে গেলেও তাঁর বংশের লোকেরা তাঁর পিছু ধাওয়া করা ত্যাগ করেনি। ফলে তাঁর ও কুরাইশদের মধ্যে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাঁকে ও তাঁর গড়া ইসলামি সমাজকে পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে কুরাইশরা শেষ রক্ত বিন্দু ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয়নি। এভাবে হিজরতের পর সুদীর্ঘ ছয়টি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এই সময় মক্কার সন্নিকটে ''হুদাইবিয়া'' নামক স্থানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে দশ বছর মেয়াদী একটি সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ''ফাতহুম-মুবীন'' –অর্থ্যাৎ '' সুস্পষ্ট বিজয়'' বলে ঘোষণা করেন। ফলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূরবর্তী স্থান সমূহে তওহীদি দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার একটা নির্বিঘ্ন সুযোগ পেয়ে যান।

এই সময় তিনি চতুর্দিকে দূত পাঠিয়ে বড় বড় রাজা-বাদশা ও শাসকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন । রোমের সম্রাট কাইজার, পারস্য সম্রাট কিস্‌রা, মিসরের কিবতী শাসক 'আজীম', হাবশার বাদশাহ গাসানী প্রধান হারিস, সিরীয় রাজা তহুম, ইয়ামামা শাসক হাওদা এবং আরবে বিভিন্ন গোত্রপতি, এমনকি সরকারি কর্মচারী, ধর্ম যাজক প্রভৃতির নিকট ইসলাম কবুলের আহবান সম্বলিত পত্র পাঠিয়ে দেন। তাতে তিনি শান্তির একমাত্র বিধান ইসলাম কবুল ও তাঁকে আল্লাহর রাসূল রূপে মেনে নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান।

এসব পত্র অকাট্যভাবে প্রমাণ বহন করে যে, বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত ও দ্বীন ছিল বিশ্বজনীন। সমগ্র পৃথিবীর জন্যই তা ছিল আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ দ্বীন এবং তিনি ছিলেন সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল। প্রেরিত পত্রসমূহের ভাষা ও বক্তব্য থেকেও একথাই প্রতিভাত হয়ে উঠে।

স্যার টমাস আরনল্ড বলেছেনঃ এই সব চিঠি যাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল, তাদের উপর এর বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। কালের স্রোত অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে, উক্ত পত্রসমূহে যা কিছু বলা হয়েছিল তা কিছুমাত্র শূন্যগর্ভ ছিল না। এই চিঠিগুলো অধিকতর স্পষ্টতা ও তীব্রতা সহকারে সেই সত্যকেই প্রমাণ করেছিল, যার কথা আল-কোরআন বারবার দাবী করে পেশ করেছে।আর তা হচ্ছে, সকল মানুষের প্রতি দ্বীন ইসলাম কবুল করার আহবান।

(আদ দাওয়াত ইলাল ইসলাম, পৃষ্ঠাঃ ৩৪)

প্রেরিত পত্রসমূহের প্রতিক্রিয়াঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত উক্ত দাওয়াতী পত্রসমূহ যে শূন্যগর্ভ উদ্দীপনায় ভরপুর ছিল না, তার বড় প্রমাণ হচ্ছে, পত্রসমূহ প্রাপক ব্যক্তিদের মধ্যে বিচিত্র ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তাদের অনেককে এসব পত্র বিশ্রামের শয্যা থেকে তীব্র কষাঘাতে জাগিয়ে দিয়েছিল; অনেককে অন্ধত্ব ও নিষ্ক্রিয়তার গহবর থেকে বাহিরে তুলে এনেছিল। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেইসব দাওয়াত সম্পর্কে সকলেই কমবেশি ভাবিত হয়ে পড়েছিল। কেউ কেউ তার নবুওয়তকে অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছিল-ঈমান এনেছিল তাঁর উপস্থাপিত দ্বীনের প্রতি। কেউ কেউ মহামূল্যবান হাদিয়া লোক মারফত পৌছে দিয়েছিল রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে। এ পর্যায়ে সীরাতুন্নবী ও ইসলামের ইতিহাস পর্যায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীতে বিস্তারিত বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে।

রোমান সম্রাট কাইজারের ভাই তাকে বলল, ফেলে দাও ওই চিঠি। তখন কাইজার স্বীয় ভাইকে লক্ষ্য করে বললঃ

এমন ব্যক্তির চিঠি কি করে ফেলে দিতে পারি, যার নিকট সবচাইতে বড় ফেরেশতা(জিবরাইল) যাতায়াত করেন।

দরবারে উপস্থিত কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান কে সম্বোধন করে বললঃ

তুমি যা বলেছ তা যদি সত্যি হয়, তাহলে কোনো সন্দেহ নেই , তিনি একজন নবী। তাঁর কর্তৃত্ব অবশ্যই আমার পায়ের তলার জমিন পর্যন্ত পৌছে যাবে।

রোমান বিশপ পত্র পাঠান্তর গীর্জায় পৌছে বহু লোকের সামনে বললঃ

হে রোমান জনতা, আমাদের নিকট 'আহমাদ'-এর একখানা পত্র এসেছে। তাতে তিনি আমাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান জানিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছিঃ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং আহমাদ আল্লাহর রাসূল।

'মুকাউকাস' বলেছেনঃ

এই নবীর ব্যাপারটি নিয়ে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। তিনি পরিত্যাজ্য কোনো কাজের আদেশ করেন না এবং মনের আগ্রহের কোনো জিনিস নিষেধও করেন না। তাঁকে পথভ্রষ্ট, জাদুকর রূপেও দেখতে পাইনা- মিথ্যাবাদী গণক রূপেও না।

কাইজারের নিয়োজিত আম্মানের শাসনকর্তা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি একখানি পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাতে তার ইসলাম গ্রহণের কথা অকপটে প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য কাইজার তা জানতে পেরে তাকে পাকড়াও করেছিল এবং ইসলাম ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু তা মানতে তিনি অস্বীকার করলেন। তখন কাইজার তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। তিনি যখন নিহত হচ্ছিলেন, তখন কবিতার একটি ছত্র পড়ে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেনঃ 'মুসলিম সমাজকে জানিয়ে দাও, আমি একজন মুসলিম, আমার হাড় মাংস সবই আমার রব-এর প্রতি একান্ত অনুগত'।

ইয়ামামার রাজা হাওদা ইবনে আলী রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পত্র পাঠিয়ে জবাব দিয়েছিলেন; তাতে তিনি লিখেছিলেনঃ 'আপনি যে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, তা কতই না সুন্দর, কতইনা উত্তম'।

বাহরাইনের শাসক মুনযির ইবনে সাভী রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত কবুল করেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের কথাও তাতে প্রকাশ করেছিলেন।

হিময়ারের শাসকবর্গ ও নাজরানের পাদ্রীগণও ইতিবাচক জবাব দিয়েছিলেন।

ইয়ামেনে কিসরা কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ, হাযরা মওত-এর শাসক, আইলার বাদশাহ ও ইয়াহুদিগণ ইসলাম গ্রহণ অথবা জিজিয়া আদায় করতে রাজি হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন।

হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী তার ঐতিহাসিক চিঠিতে ইসলাম কবুলের কথা এতটা দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করেছিলেন যে, তার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েবানা নামাযও পড়েছিলেন। এখানে আমরা শুধু নমুনাস্বরূপ প্রেরিত পত্রসমূহের কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করলাম। এ হচ্ছে বিপুলের মধ্যে অতি সামান্যে কয়েকটি কথা। এসব থেকে শুধু এটুকুই প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীর্ঘ দাওয়াত এবং তাঁর মহান নবুওয়ত ছিল বিশ্বজনীন। কোনো একটি দেশ বা কোনো একটি এলাকা কিংবা নির্দিষ্ট কোনো জাতি ও গোষ্ঠীর জন্য একান্তভাবে নির্দিষ্ট ছিল না।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরিত দ্বীন কবুলের আহ্বান সম্বলিত দাওয়াতি পত্রাদির প্রতিক্রিয়া উল্লেখ প্রসঙ্গে পারস্য সম্রাট কিসরার প্রতিক্রিয়াটি অনুল্লেখিত থাকা ঠিক হবে না, বিধায় আমাদের স্মরণ করতে হচ্ছে যে, কিসরা তার পূর্ব বংশ সামানীদের উত্তরাধিকারী হিসেবেই সিংহাসনে আসীন হয়েছিল। সে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বীন কবুলের দাওয়াত প্রত্যাখান করেছিল- একজন আরবের অধীনতা(?) মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। শুধু তাই নয়, দ্বীন ইসলামের এই দাওয়াতকে সে তার নিজের জন্য ও সিংহাসনের জন্য বিপজ্জনক হুমকি মনে করেছিল।

এ কারণে সে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্রখানি টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল। ইয়ামেনে নিযুক্ত তার শাসনকর্তা 'বাযান' কে লিখে পাঠাল যে, তুমি হিজাজের এই ব্যক্তির নিকট দু'জন লোক পাঠিয়ে দাও। তারা যেন তাকে গ্রেফতার করে আমার নিকট নিয়ে আসে। বস্তুত এ হচ্ছে বিশ্বময় রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বীন কবুলের আহবানের এক ধরনের প্রতিক্রিয়া। এসব থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে, তাঁর দাওয়াত ছিল বিশ্বজনীন, তিনি ছিলেন বিশ্বনবী, বিশ্বের সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের জন্য নবী ও রাসূল। কেননা যারা সে দাওয়াত কবুল করেছিলেন, তারা এ দ্বীনকে মানুষের গ্রহণযোগ্য মনে করেই করেছিলেন। আর যারা প্রত্যাখান করেছিল তারাও তাকে তাই মনে করেই করেছিল। নতুবা কোনো জাতীয়তাবাদী ধর্ম অন্য জাতির লোকদের জন্য না গ্রহণের প্রশ্ন উঠে, না প্রত্যাখানের।

বিশ্বজনীন রিসালাত প্রমাণকারী আয়াতঃ

এ পর্যায়ে কুরআন মজিদ থেকে কিছু আয়াত উদ্ধৃত করার প্রয়াস পাব, যা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে যে, রাসূলে করীমসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাত ছিল বিশ্বজনীন, ছিল সমগ্র বিশ্বের সকল শ্রেণীর সকল পেশার মানুষের জন্য। তা যেমন কোনো বিশেষ দেশ বা অঞ্চল কিংবা ভাষা, বর্ণ ও বংশের লোকদের জন্য ছিল না, তেমনি কেবল এক কালের লোকদের জন্যও ছিল না। তা ছিল সারা পৃথিবীর সকল কালের, সকল মানুষের জন্য সমানভাবে গ্রহণীয় ও অনুসরণীয়। তিনি সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণ বিধানের জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন। এ পর্যায়ে নিম্নে কুরআন মজিদের আয়াতসমূহ কয়েকটি ভাগে উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ

প্রথমত: বহু সংখ্যক আয়াত স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, তাঁর রিসালাতের পরিধি সারা বিশ্বব্যাপী। তিনি সর্ব শ্রেণীর মানুষের প্রতিই প্রেরিত রাসূল। আল্লাহ তাঁকে সমগ্র বিশ্বলোকের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন।

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বল, হে মানুষ আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল ।

(আল-আ'রাফঃ ১৫৮)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿28﴾

আর, আমি তো কেবল তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।

(সূরা সাবাঃ ২৮)

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿79﴾

আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট।

(আন্ - নিসাঃ ৭৯)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿107﴾

আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসির জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।

(আল-আম্বিয়াঃ ১০৭)

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿1﴾

তিনি বরকতময় যিনি তার বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন ,যেন সে জগত বাসির জন্য সতর্ক কারী হতে পারে।

(আল্ ফুরকানঃ ১)

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

আর এ কোরআন আমার কাছে ওহী করে পাঠানো হয়েছে যেন তোমাদেরকে ও যার কাছে এটা পৌঁছবে তাদেরকে এর মাধ্যমে আমি সতর্ক করি।

(আল আন'আমঃ ১৯)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿9﴾

তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

(আস্-সাফঃ ৯)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ﴿170﴾

হে মানুষ! এই রাসূল তোমাদের নিকট তোমাদের রবের নিকট থেকে সত্য বিধান নিয়ে এসেছে। অতএব, তোমরা (তার প্রতি) ঈমান আন, তা তোমাদের জন্য অতীব কল্যাণকর।

(সূরা আন-নিসাঃ ১৭০)

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿1﴾

আলিফ-লাম-রা; এই কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন, পরাক্রমশালী সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে।
(সূরা ইব্রাহীমঃ১)

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿138﴾

এই কিতাব সমগ্র মানুষের জন্য বর্ণনা, হেদায়েতের বিধান এবং তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য উপদেশ।
(আলে-ইমরানঃ ১৩৮)

কেবল মাত্র এই ক'টি আয়াতই নয়, আরও বহু সংখ্যক আয়াত রয়েছে, যা সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এই কুরআন যেমন সকল মানুষের জন্য, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়তও তেমনি সকল মানুষের জন্য। এ পর্যায়ের কিছু আয়াত এখানে উদ্ধৃত করছি,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿21﴾

হে মানুষ তোমরাসকলে তোমাদের সেই রবের দাসত্ব কবুল কর-ইবাদত কর- যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে। যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার।
(আল-বাকারাঃ২১)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿168﴾

হে মানুষ! তোমরা আহার কর পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে পবিত্র হালাল, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।
(আল-বাকারাঃ ১৬৮)

উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে সুস্পষ্ট ভাষায়ঃ 'হে মানুষ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ফলে এ সম্বোধনের আহবান মানুষ বলে পদবাচ্য সকলেরই জন্য, সকলের প্রতি। বিশেষ কোনো অংশের মানুষের জন্য নয়।এতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন পেশ করেছেন তা সকল মানুষের জন্য যেমন, তেমনি তার নবুওয়তও সর্বকালের সকল মানুষের জন্য। ইসলাম বিশ্বজনীন দ্বীন। যদি তা না হত, তাহলে কুরআনে এরূপ সম্বোধন উদ্ধৃত হওয়ার কোনো তাৎপর্যই থাকত না। অথচ কুরআনের ষোলটি আয়াতে 'হে মানুষ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

তাছাড়া 'আহলে কিতাব'- অর্থাৎ ইয়াহুদি ও খৃষ্টানদেরও সম্বোধন করা হয়েছে কুরআন মজিদের মোট বারটি আয়াতে। ওরা তো কোনো না কোনো ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী ছিল; আসমানি কিতাবের ধারক হিসেবে পরিচিতও ছিল ওরা। ওদেরকে সরাসরি সম্বোধন করে রাসূলের প্রতি ঈমান আনার আহবান জানানোর কি অর্থ হতে পারে? তাতে এটাই বুঝা যায় যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবী রাসূল হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পর নির্বিশেষে সকল মানুষেকে তারই প্রতি ঈমান আনতে হবে, কেননা পূর্বের সব নবী ও রাসূলের নবুওয়ত ও রিসালাতের মিয়াদ শেষ হয়ে গেছে। অত:পর অন্য কারোর নবুওয়ত বা রিসালাত চলতে পারে না।
উপরন্তু কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে সাধারণ বিষয়ের অবতারণা করে বহু সংখ্যক বিধান পেশ করা হয়েছে; সে বিধান বিশেষ কোনো বর্ণ, বংশ বা দেশের লোকদের জন্য নয়। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বসবাসকারী সকল মানব সমাজের সংশোধন ও পুণর্গঠনের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর রিসালাত কোনো বিশেষ সীমার মধ্যে সীমিত বা সংকুচিত ছিল না। এ পর্যায়ের কতিপয় আয়াতঃ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿97﴾

আল্লাহর জন্য (আল্লাহর) ঘরের হজ করা সাধারণভাবে সব মানুষেরই কর্তব্য- যারা সেই পর্যন্ত যাতায়াতে সামর্থ্যবান।

(আল-ইমরানঃ ৯৭)

এ আয়াতের বক্তব্য হল, যে মানুষ আল্লাহর ঘর পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক ও অর্থনৈতিক সামর্থ্যের অধিকারী হবে, তাকেই এই ঘরের হজ করতে হবে। আল্লাহর জন্য তা একান্তই কর্তব্য এবং এ কর্তব্য উক্ত গুণের অধিকারী প্রতিটি মানুষেরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-সে মানুষ যে দেশের, যে বংশের ও যে কালেরই হোক না কেন। কুরআনের আয়াতে এই কর্তব্য কেবল আরবদের জন্য বা সে কালের লোকদের জন্য, এমন কথা বলা হয়নি।

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ

মসজিদে হারাম, যা আমরা সমস্ত মানুষের জন্য বানিয়েছি, তথায় স্থানীয় বাসিন্দা ও বহিরাগতদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে সমান।

(আল-হজ্জ:২৫)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴿6﴾

লোকদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা মন ভুলানো কথা খরিদ করে আনে, যেন সঠিক জ্ঞান ব্যাতিরেকেই আল্লাহর পথ থেকে লোকদের ভ্রষ্ট করা যায়।

(সূরা লুকমানঃ ৬)

এখানে কথার ধরন যাই হোক, সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহর পথ থেকে গুমরাহকারী যে কোনো মনভুলানো কালাম বা কথা ক্রয় করা বা তার ব্যবহার করা ইসলামি শরিয়াতে সম্পূর্ণ হারাম এবং এ হারাম সকল মানুষের জন্য। গায়ক-গায়িকা, নৃত্যশিল্পী বা যৌন সুরসুরি দানকারী নাটক থেকে শুরু করে সকল প্রকারের অশ্লীল কাজ এ আয়াত অনুযায়ী নিষিদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত।

কেননা আয়াতে আল্লাহর দিক থেকে মন ভুলানো যে কোনো জিনিসকে সকল মানুষের জন্যই সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

চতুর্থত: কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, তার হেদায়াত বিশেষভাবে কোনো সমাজ বা জনসমষ্টির জন্য নয়, বিশেষ কোনো কাল বা সময়ের লোকদের জন্য নয়, বরং আসমানের নিচে জমিনে অবস্থানকারী সমস্ত মানুষের জন্য । এ প্রসঙ্গের কতিপয় আয়াতঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿174﴾

হে মানুষ, তোমাদের নিকট তোমাদের রবের নিকট থেকে অকাট্য দলিল এসে গেছে এবং আমরা তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট (আলোকবর্তিকা) নূর অবতীর্ণ করেছি।

(আন-নিসাঃ ১৭৪)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ

রমজান মাস যাতে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য হেদায়াতের বিধান হিসেবে কুরআন নাযিল হয়েছে।

(আল-বাকারাঃ ১৮৫)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿27﴾

আমরা এই কুরআনে মানুষের জন্য নানা রকম ও নানা প্রকারের দৃষ্টান্ত পেশ করেছি এই আশায় যে, তারা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।

(সূরা-যুমারঃ ২৭)

এই গ্রন্থ, তা তোমাদের প্রতি আমরা এ জন্যে নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদের কে পুঞ্জীভুত অন্ধকারের মধ্যে থেকে আলোকের দিকে বের করে নিয়ে আসতে পার।

(সূরা ইব্রাহীমঃ ১)

এ ক'টি আয়াতই জানাচ্ছে যে, কুরআন সকল মানুষের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এটি সকলের জন্য আলো; অজ্ঞানতা ও পাপ পঙ্কিলতার অন্ধকার থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে এই কুরআন এবং তা

বিশেষভাবে কারো জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই। এই প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াতাংশটি বিশেষভাবে প্রনিধান যোগ্য।

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿3﴾

আর এই রাসূলের আগমন অন্যান্য সেই লোকদের জন্যও, যারা এখনো তাদের সাথে এসে মিলিত হয়নি।
(আল-জুম'আঃ ৩)

এই 'অন্যান্য লোক' বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে? নিশ্চয়ই সেই সব লোক যারা উত্তরকালে কিয়ামত পর্যন্ত আরব–অনারব নির্বিশেষে এসে এই মুসলিমদের সাথে ঈমানের ভিত্তিতে মিলিত হবে। ফলে এই আয়াতাংশও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশ্বজনীন ও চিরন্তন নবুওয়ত ও রিসালাতের কথাই প্রমাণ করছে। সেই সাথে এই কথাও প্রকারান্তরে প্রমাণিত হয় যে, তার এই নবুওয়ত ও রিসালাত পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত ও সম্প্রসারিত। তাঁর পর আর কোনো নবী বা রাসূলের আগমনের কোনো সম্ভাবনাই নেই। আসার কোনো অবকাশ নেই।

এসব আলোচনার সারকথা দাঁড়াল, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাত ও নবুওয়তের বিশ্বজনীনতা ও সার্বজনীনতা অবশ্য স্বীকৃত। এটি না কোনো জাতীয়তা ও আঞ্চলিকতার গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ, না কাল ও যুগের সীমা দ্বারা পরিবেষ্টিত। উপরের যে চার পর্যায়ের আয়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার প্রথম পর্যায়ের আয়াত প্রমাণ করছে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাতের সার্বজনীনতা, দ্বিতীয় পর্যায়ের আয়াত প্রমাণ করছে মৌলিক ও খুটিনাটি সব ব্যাপারেই কুরআনি সম্বোধনের সাধারণত্ব, তৃতীয় পর্যায়ের আয়াত স্পষ্ট করে যে, বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে প্রদত্ত হুকুম- আহকাম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য। আর চতুর্থ পর্যায়ের আয়াত দেখাচ্ছে যে, কুরআনের হেদায়াত ও সতর্কীকরণ বিশেষ কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠির জন্য নয়, বরং সকল মানুষের জন্য ব্যাপকভাবে।

ভিন্নতর দৃষ্টিকোণে রাসূলের সর্বজনীনতা,

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাতের সার্বজনীনতা ভিন্নতর দৃষ্টিকোণেও বিবেচ্য। এই দৃষ্টিকোণটিও ইসলামের প্রকৃতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। বিশ্বলোক, জীবন ও মানুষ এবং আইন প্রণয়ন ও শরিয়তের বিধান রচনার দিক দিয়েও ইসলামি দৃষ্টিকোণের ব্যাপক বিশালতা লক্ষ্যনীয়।

বস্তুত ইসলাম তার আইন নির্ধারণ এবং মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ চিন্তায় মানবতার সেই সাধারণ প্রকৃতির উপর সমস্ত মানব বংশের সৃষ্টি ও সঙ্ঘটন বাস্তবায়িত হয়েছে, যা মানুষের সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে একেবারে অতি সাধারণ ও সকলের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। কেউই তার বাইরে নয়। এ দিক দিয়ে দুনিয়ার কোনো অঞ্চলের মানুষের সাথে অপর অঞ্চলের বা কোনো সময়কালের মানুষের সাথে অপর সময়কালের মানুষের বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। আর ইসলাম যখন সকল মানুষের এই অভিন্ন প্রকৃতি ও জন্মগত স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বিধান পেশ করেছে, তখন সেই বিধান গ্রহণ বা পালনের দায়িত্বের দিক দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বা বিভিন্ন সময়কালের মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা হবে কেন? কেন বলা হবে, ইসলাম কেবল অমুক এলাকার বা অমুক সময়ের লোকদের জন্য আর অমুক অমুক এলাকার অমুক অমুক লোকদের জন্য নয়? ইসলামের ব্যাপারে এই ধরনের কথা নিতান্তই যুক্তিহীন।

কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপস্থাপিত জীবন বিধান দ্বীন ইসলামের ব্যাপক ভিত্তিকতা ও দিক বৈচিত্রের প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায় যে, মানুষের জীবনে যত দিক, যত বিভাগ ও যত সমস্যা থাকতে পারে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোনো একটি দিক , বিভাগ বা সমস্যাই বাদ দিয়ে কথা বলেননি, বরং সকল দিক, বিভাগ ও সমস্যা সম্পর্কেই কথা বলেছেন । এ দিকটাও অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সার্বজনীন- সকল মানুষের জন্যই নবী ও রাসূল ছিলেন। কোনো বিশেষ শ্রেণীর বা বিশেষ সমস্যায় জর্জরিত জনগণের সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর আগমন হয়নি।

এ বিষয়ে যত চিন্তাই করা হবে, নিঃসন্দেহে দেখা যাবে যে, ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তার মহামূল্যবান শিক্ষা, সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং আইনগত রীতিনীতি বারবার বিবেচনা করলেও কিছুতেই বুঝা যাবে না যে, তা বিশেষ কোনো যুগের বা এলাকার জন্য নির্দিষ্ট। কারণ বিশেষ বা নির্দিষ্ট শরিয়তের রচিত বিধানের বিশেষ

কতগুলি চিহ্ন বা নিদর্শন থাকে। প্রথমত: তাতে থাকবে বিশেষ পরিবেশগত বিশেষত্ব কিংবা স্থানীয় পরিবেশগত বিশেষত্ব- এভাবে যে, সেই পরিবেশ বদলে গেলে কিংবা সেই বিশেষত্ব না থাকলে বা সেই বৈশিষ্ট্য তিরোহিত হলে সেই জীবন বিধান কার্যকর হবে না, তদনুযায়ী জীবন যাপন করাও সম্ভব হবে না। তখন তা মরীচিকায় পরিণত হয়। তার কল্যাণকর ব্যাবস্থাদিও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। কিন্তু ইসলামে সে রকম চিহ্ন বা নিদর্শন পাওয়া যায় কি?

এ পর্যায়ে আমরা অনায়াসেই জ্ঞান ও আমলের ক্ষেত্রে ইসলামের উপস্থাপিত কতিপয় বিষয় পর্যালোচনার জন্য গ্রহণ করতে পারি। তাহলে এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আরো সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। সর্বাগ্রে আমরা আল্লাহর কিতাব কুরআন মজিদকে এই পর্যালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করতে পারি। বস্তুত কুরআন হচ্ছে এক চিরন্তন মুজিজা। চৌদ্দশ বছর ধরে তা এই দুনিয়ায় জ্ঞানের আলো বিতরণ করে আসছে। দুনিয়ার মানুষ যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখনই কুরআন তার দিকপ্লাবী আলোকচ্ছটা বিকীরণ করেছে। মানুষ হারিয়েছিল তার মনুষ্যত্ব, মানবিক মর্যাদা, তার মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা। মানুষের পরস্পরের মধ্যে ছিল প্রচন্ড দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মারামারি ও রক্তপাত। চতুর্দিকে ছিল জংলী ব্যবস্থা। মানুষ ছিল ভীত সন্ত্রস্ত।

এ পরিস্থিতিতেই কুরআন অবতীর্ণ হতে শুরু করে। এবং তুলে ধরে বিশ্ব উজ্জ্বলকারী আলোকছটা। মানুষকে ফিরিয়ে দেয় তার মনুষ্যত্ব, মানবিক মর্যাদা ও অধিকার। সামাজিক ন্যায়বিচার ও ইনসাফের ভিত্তিতে গড়ে তোলে মানুষের এক একটি সমাজ- কেবল আরব উপদ্বীপেই নয়, তার বাইরে প্রায় সকল দেশে। ইসলামের শিক্ষা আইন বিধান আদেশ নিষেধ রীতি নীতি ও কর্তব্য সকল সমাজের জন্যই নির্বিশেষে মানবীয় কল্যাণের বিধায়ক। সে কল্যাণ লাভে কোনো এক অঞ্চলের লোকদের অপর অঞ্চলের লোকদের চেয়ে অধিক সুবিধাভোগী এবং অপর কোনো অঞ্চলের লোকদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে দেখা যায়নি। কোনো এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণ করে সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে উন্নতির উচ্চ শিরে আরোহন করতে পেরেছে আর অপর জন সমষ্টি গুমরাহকারী অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে, এমনটাও কখনো ঘটেনি।

তার কারণ, ইসলাম এক নির্ভুল জীবন দর্শন উপস্থাপন করেছে; খালেস তাওহীদি আকীদাই হচ্ছে তার মৌল ভাবধারা আর তা-ই হচ্ছে সমস্ত মানব সমাজের সংশোধনের নির্ভুল উপায়।

ইসলাম সকল প্রকারের শিরক ও শিরকি আকীদার উপর আঘাত হেনেছে। মূর্তি পূজা বা আকাশ গমনের অবয়বের আরাধনা ও উপাসনা বন্ধ করেছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়েছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির নিকট নতি বা আনুগত্য স্বীকারের সমস্ত রীতি-ব্যবস্থাকে খতম করেছে, শিরক এর সমস্ত বন্ধন ও প্রভাব থেকে মানব সমাজকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। গুমরাহকারীর সমস্ত ফাঁদ থেকে মানুষকে রক্ষা করেছে। প্রস্তর পূজা, অগ্নি পূজা ও পশু পূজার অর্থহীনতাকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। কেননা এগুলোর ভাল বা মন্দ - ক্ষতি বা উপকার কিছুই করার একবিন্দু ক্ষমতা নেই। পশুগুলো এতই অক্ষম যে, ওরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না।মানুষ পূজার মানুষের গোলামী করার এবং বলবান মানুষের মনগড়া আইন পালনের অন্তসারঃশূন্যতাকেও সুস্পষ্ট করে তুলেছে। ফলে মানুষ ফিরে পেয়েছে তার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য। এ ক্ষেত্রে আরব উপদ্বীপ ও তার বাইরের মানুষের মধ্যে বিন্দুমাত্র তারতম্য দেখা যায়নি। তা ছিল নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতিই ইসলামের উদার অবদান।

ইসলামের এই জ্ঞান পরিচিতি এই তওহীদি আকীদাতো এমন নয় যে, তা কোনো বিশেষ এলাকার মানুষ গ্রহণ করতে পারে আর অপর এলাকার মানুষেরা পারে না।

সূরা আল-হাদীদের শুরুর আয়াত ক'টি গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পাঠ করলে যে কেউ অনুভব ও স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, এ আয়াত ক'টির শিক্ষা অতীব উন্নতমানের এবং অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ। তা কখনই বিশেষ কোনো এলাকার লোকদের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশিত হতে পারে না। অন্য এলাকায় তা বাস্তবায়িত হওয়ার অযোগ্যও নয় কোনো একটি দিক দিয়েও।

আয়াত ক'টির বাংলা অনুবাদ হচ্ছেঃ মহান আল্লাহর প্রসংশা করছে প্রত্যেকটি জিনিসই যা ভূ-মন্ডলে ও আকাশমন্ডলে রয়েছে। ভূ-মন্ডল ও আকাশমন্ডলের রাজত্ব ও সার্বভৌমত্বের নিরঙ্কুশ মালিক একমাত্র তিনিই । জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন কেবল তিনিই এবং সব কিছুর উপর তিনিই শক্তিমান।

ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকাম, ইবাদত ব্যবস্থা, পারস্পরিক লেনদেন, নৈতিকতা প্রভৃতি পর্যায়ের আদর্শ ও আইন বিধানের কোনো একটি সম্পর্কেও কি একথা বলা যায় যে, তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পালনযোগ্য আর অপরাপর ক্ষেত্রে পালনযোগ্য নয়? না কখনোই নয়।

ইসলাম পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের যে সব বিধি-বিধান পেশ করেছে- বিয়ে, সন্তান লালন-পালন, তালাক, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য, এতিমদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, অসিয়ত কার্যকর করণ, মানুষের পারস্পরিক মিলমিশ, আমানত সংরক্ষণ, সকলের প্রতি উত্তম ব্যবহার প্রদর্শন, ন্যায় কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পাপ কাজে অসহযোগিতা পর্যায়ের আইন বিধান, এর মধ্যে কোনটি এমন যা পৃথিবীর সকল দেশে, সকল অঞ্চলে ও সকল সমাজে বাস্তবায়ন করা যায় না?

ইসলামের নৈতিক আদর্শ ও তদসংক্রান্ত বিধি বিধান দ্বীন ইসলামের গৌরবের বিষয়। তার বৈশিষ্ট্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল নৈতিক বিধানকে অতিক্রম করে গেছে। ইসলাম সত্য ও সততার নীতি, আমানত রক্ষার নীতি, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন, পরস্পরের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ, ক্ষমাশীলতা, ত্যাগ তিতিক্ষা, মেহমানদারী, বিনয়, শোকর, তাওয়াক্কুল, নিষ্ঠা প্রভৃতি নৈতিক ভাবধারাসম্পন্ন আদর্শ উপস্থাপন করেছে। পক্ষান্তরে মিথ্যা, কার্পণ্য, বিশ্বাসঘাতকতা, শঠটা, কপটতা, অন্যায় দোষারোপ, ক্রোশ, আক্রোশ, হিংসা-দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, ধোকা-প্রতারণা, অহংকার প্রভৃতি হীন ও জঘন্য কার্যকলাপ পরিহার করার উপদেশ দিয়েছে।

ইসলাম এক অপূর্ব রাজনৈতিক দর্শন ও ব্যবস্থা পেশ করেছে, যাতে সার্বভৌমত্ব ও আইন রচনার মৌলিক ও নিরঙ্কুশ অধিকার কেবল জাহানের স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত। মানুষ তা গ্রহণ করে তারই মত মানুষের গোলামি করার ঘৃণ্য লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পেতে পারে। ইসলাম যুদ্ধ নীতি সংস্কার করেছে। যুদ্ধের কারণসমূহ বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। জাতীয় সম্পদের অপচয় বন্ধ করেছে। তাতে জনগণের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করেছে, ব্যবসা বাণিজ্যকে হালাল ঘোষণা করেছে, সুদ ও সর্বপ্রকার শোষণকে হারাম করেছে। এসব ক্ষেত্রে কি কোনো গোত্র বা আঞ্চলিকতার গন্ধ পাওয়া যায়? এই পর্যায়ে কোরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিবেচনা করে দেখা যাকঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿90﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচার, ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয় স্বজনকে দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং অন্যায়, পাপ, নির্লজ্জতা ও জুলুম অত্যাচার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে এ সব উপদেশ দিচ্ছেন শুধু এই আশায় যে, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।

(সূরা আল নাহলঃ ৯০)

কুরআনের এই বিধানসমূহ কি সাধারণভাবে সর্বজনগ্রাহ্য নয় ? নয় কি তা সকল মানুষের জন্য পরম কল্যাণের ধারক? এ ব্যাপারে কি দেশ, মহাদেশ আর উপমহাদেশ জনিত কোনো ভৌগলিক পার্থক্য ও তারতম্যের এক বিন্দু প্রভাব আছে?

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴿58﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ সে সবের প্রকৃত পাওনাদার বা সেসব পাওয়ার উপযুক্তদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। আর তোমরা যখন লোকদের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের সাথে করবে।

(আন্ নিসাঃ ৫৮)

কুরআন প্রদত্ত ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের নির্দেশ ছিল একান্তভাবে নৈব্যক্তিক , সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ এবং তা এমন প্রেক্ষিতে দেয়া হয়েছিল যখন প্রভাবশালী ইয়াহুদি সমাজ এমন পক্ষপাতদুষ্ট নীতির উপর অবিচল ছিল যে, আরবের উম্মি জনগণ তথা মুসলমান এবং অ-ইয়াহুদি লোকদের প্রতি ন্যায়বিচারের কোনো বাধ্যবাধকতা তাদের উপরে নেই। তা কেবল ইহাহুদিদের জন্যই আবশ্যিক অন্যদের প্রতি নয়। তাদের এইরূপ নীতি গ্রহণের মূল কারণ ছিল এই যে, তাদের ধারণা ছিল, তাদের ধর্ম গোত্র ভিত্তিক ও কেবল তাদেরই জন্য। অন্য কারোর কোনো অধিকার তাতে নেই। কিন্তু ইসলাম সার্বজনীন দ্বীন। নির্বিশেষে সকল মানুষের পক্ষে

অনুসরণীয় ও প্রয়োগযোগ্য বিধানই ইসলাম দিয়েছে। মুসলিম ও অমুসলিমের ব্যাপারে তাতে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿104﴾

তোমাদের মধ্যে একটি এমন জনগোষ্ঠী অবশ্যই থাকতে হবে, যারা সার্বিক কল্যাণের দিকে আহবান করবে, আদেশ দিবে ন্যায়ের এবং নিষধ করবে সকল অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই প্রকৃত সফলকাম।

(সূরা আলে ইমরানঃ ১০৪)

কেবল মাত্র নমুনা স্বরূপ এই ক'টি আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা হল, যদিও বিষয়টি শুধু এই ক'টি আয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের ব্যাক্তিগত ও সমষ্টিগত ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আরও অনেক উন্নতমানের নৈতিক বিধান উপস্থাপন করেছে কুরআন। সেই সবগুলিকে তো আর এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়।

ইতিবাচকভাবে কেবল ভালো ভালো চরিত্রের কথাই নয়, চরিত্রের মন্দ দিকগুলিকেও কুরআনুল কারীম তুলে ধরেছে এবং তা পরিহার করে চলতে নির্দেশ দিয়েছে। এই জন্য যে, তা করলে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ ঘটে এবং স্বয়ং ব্যক্তি ও সমষ্টিরও ঘটে নৈতিক পতন ও বিপর্যয়। আর এই উভয় ধরনের আদেশ উপদেশ পালন করে কেবল মুসলমানেরাই উপকৃত হয়নি, অমুসলিমরাও এসব কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে নি। অতএব ইসলাম যদি আঞ্চলিক ধর্ম বা জীবন বিধান হত কিংবা হত বিশেষ কাল ও শতাব্দির জন্য নির্দিষ্ট, তাহলে তা দ্বারা সকল দেশের, সকল সময়ের, সকল মানুষের কল্যাণ সাধন করা সম্ভবপর হত না।

মানব প্রকৃতির প্রতি ইসলামের দাওয়াতঃ

ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকাম এবং ইলম ও আমল সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি বিধান মানব প্রকৃতির ভিত্তিতে রচিত । সে প্রকৃতিতে সকল দেশের ও সকল কালের মানুষই সর্বতোভাবে সমান। তওহিদি আকিদা, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, গণঅধিকারের স্বীকৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপক বিস্তৃতি, সকল প্রকার হীনতা-নীচতা ও জঘন্য কার্যাদি পরিহার, হিংস্রতা, লালসা, জিঘাংসা, পুরাতনের নির্বিচার অনুসরণ, মিথ্যাচার, কুসংস্কার, বৈরাগ্যবাদ ও সংসার জীবন পরিহার- প্রভৃতি পর্যায়ের শত সহস্র নিষেধ সূচক বিধি বিধান সর্ব মানুষের জন্য প্রভূত কল্যাণকর । তা সবই নির্বিশেষে সকল মানুষেরই স্বভাব প্রকৃতির চাহিদা বা দাবী।

সমস্ত মানুষের প্রকৃতি এক, তার দাবিও অভিন্ন আর ইসলামের বিধান তারই প্রেক্ষিতে তার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করেই রচিত। ফলে তা বিশেষ কোনো জাতি বা লোক সমষ্টির জন্য কল্যাণবহ হবে এবং অন্যদের জন্য হবে ক্ষতিকর এমনটা কখনই হতে পারে না। একথাও বলা সঙ্গত হতে পারে না যে, ইসলামের বিধান কুরআন ও সুন্নাতের সীমিত পরিবেষ্টনিতে আবদ্ধ আর মানবীয় সমস্যা পরিবর্তনশীল, নিত্য নতুন সজ্ঘটিত ও উদ্ভুত; ফলে ইসলাম মানবীয় সমস্যার সমাধান দিতে পারে না – না পারলেও এক অঞ্চলে বা এক সময়ে পেরেছিল, অন্য অঞ্চলে বা অন্য সময় তা পারে না। ইসলামের সার্বজনীন ও সর্বকালীন বিশেষত্ব সম্পর্কে যাদের এক বিন্দু ধারণা নেই, কেবল তাদের মনেই এ ধরনের কথা বাসা বাঁধতে পারে কিংবা যারা এককালে ইসলামের মহাকল্যাণ ও অবদানের কথা স্বীকার করে মুসলিম যুবকদের নতুন ও ভিন্নতর কোনো মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তারাই এ ধরনের কথা বলতে পারে। প্রকারান্তরে এটাও ইসলামের সাথে এক মহা শত্রুতা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা সাধারণভাবেই প্রশ্ন তোলা যায়, ইসলাম যদি অতীতের কোনো এক সমাজে বা এককালে মানবতার কল্যাণ সাধন করেই থাকে, তাহলে বর্তমানেও দুনিয়ার সকল দেশে সেই ইসলামই কেন প্রযোজ্য হবে না, কেন কল্যাণ করতে পারবে না? দ্বীন ইসলামে যেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি, তেমনি একবিন্দু পার্থক্য তো দেখা দেয়নি বিশ্ব প্রকৃতিতে ও মানুষের মৌলিক স্বভাবে?

ইসলাম প্রতিক্রিয়াশীলতা পরিপন্থী: এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম এক বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন দ্বীন। সকল প্রকার ভৌগলিক আঞ্চলিকতা ও সময় কালের সীমাবদ্ধতার সমস্ত বেড়াজালকে তা ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে।

গোত্র, বর্ণ, বংশ বা জাতি প্রভৃতি যাবতীয় সংকীর্ণতাকে ইসলাম পূর্ণ সাফল্যের সাথে এড়িয়ে গেছে। কোনোরূপ বস্তুগত বা কালগত পার্থক্যকেই ইসলাম স্বীকার করেনি কোনোদিন। তবে ইসলাম মানুষে মানুষে পার্থক্যের একটি মাত্র ভিত্তিকে স্বীকৃতি দিয়েছে আর তা হচ্ছে তাকওয়া- আল্লাহকে ভয় করে চলার পবিত্র ভাবধারার দিক দিয়ে কে অগ্রসর আর কে পশ্চাদপদবর্তী। এই একটি মাত্র প্রশ্নে যে অগ্রসর তাকে ইসলাম অগ্রাধিকার দিয়েছে আর যে তা নয়, তাকে অগ্রাধিকার দিতে ইসলাম রাজী নয়।
মানুষে মানুষে পার্থক্যের এই ভিত্তি পুরোপুরি গুণগত ব্যাপার। এ গুণটি কারোর পক্ষে অর্জনীয়, কারো পক্ষে নয়, এমন নয়; বরং নির্বিশেষে সকল মানুষই এই গুণ নিজের মধ্যে অর্জন করতে পারে এবং পারে এ গুণের বলে অধিক মর্যাদাবান হতে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿13﴾

হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, এর মাধ্যেমে তোমরা পারস্পরিক পরিচিতি লাভ করবে। তবে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানার্হ সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্য সর্বাধিক তাকওয়াধারী।

(আল হুজরাতঃ ১৩)

এ আয়াত দুনিয়ার সকল প্রকার বংশ গোত্র বা জাতিভিত্তিক হিংসাদ্বেষ, আত্মম্ভরিতাকে ভেঙ্গে ফেলেছে। বিশ্বমানবতার প্রতি এটাই ইসলামের অবদান। এর পূর্বে অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদই এর উদার মানবিকতার আদর্শ পেশ করতে বা গ্রহণ করতে পারেনি। ইসলামের পক্ষে তা পেশ করতে সম্ভব হয়েছে তার তওহিদি আকীদার কারণেই। এ আকীদা অনুযায়ী বিশ্ব স্রষ্টা যেমন এক আল্লাহ, তেমনি বিশ্বমানবতাও একই পিতা মাতা থেকে উৎসারিত, সর্বতোভাবে অভিন্ন, সকল মানুষ একই পিতা মাতার সন্তান, সকলের দেহে একই পিতা মাতার রক্ত। এ পর্যায়ে স্বয়ং রাসূলে করীমসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘোষণাবলী অত্যন্ত উদাত্ত ও বলিষ্ঠ। এখানে তার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ
'' হে মানুষ আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহিলিয়াতের যাবতীয় আত্মম্ভরিকতা ও তা নিয়ে গৌরব অহংকার দূর করে দিয়েছেন। তোমরা সকলেই আদম সন্তান এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। তবে আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ও উত্তম সেই বান্দা যে তাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু''।
ইসলামের সার্বজনীনতা ও সর্বকালীন প্রমাণকারী উপরোদ্ধৃত অকাট্য দলিল প্রমাণ স্বত্ত্বেও পাশ্চাতের ইসলামের দুশমন প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম মূর বলতে দ্বিধাকরেন নি যে, '' ইসলামের বিশ্বজনীনতার ধারনা পরবর্তীকালে সৃষ্ট'' এ পর্যায়ের বহুসংখ্যক আয়াত ও হাদীস বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি বলেছেনঃ এমনকি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সম্পর্কে তা চিন্তা করেননি। তিনি চিন্তা করেছিলেন, এ কথা মেনে নিলেও তার চিন্তা ছিল প্রচ্ছন্ন। আসলে তার চিন্তার জগত ছিল শুধু আরব দেশ। তার উপস্থাপিত দ্বীন কেবল আরবদের জন্য রচিত। আর মুহাম্মদ তার দাওয়াত নবুওয়ত লাভের সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কেবল আরবদের সম্মুখেই পেশ করেছেন, অন্য কারোর জন্য নয়''।
স্পষ্টত মনে হচ্ছে, উইলিয়াম মূর নিতান্ত অন্ধ বলেই ইসলামের বিশ্বজনীনতাকে দেখতে পাননি, তার সংকীর্ণতা ও দৃষ্টিভ্রম এর একমাত্র কারন ।
মনে হচ্ছে তিনি একজন ইতিহাসবিদ হয়েও তদানিন্তন আরবের বিশ্ব বাণিজ্য পরিক্রমা সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত ছিলেন না। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের বাইরের দেশ সমূহ সম্পর্কে জানতেন না, নবুওয়ত লাভ করার পর তিনি সমগ্র দৃষ্টি কেবল আরব দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন- এ ধরনের কথা ইতিহাসের দৃষ্টিতেই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কে না জানে তিনি নবুয়াত লাভের পূর্বে আরব উপদ্বীপের বাইরে ব্যবসা উপলক্ষে যাতায়াত করেছেন? তা সত্ত্বেও কি এ কথা বলা যেতে পারে যে, তিনি আরব দেশ ছারা অন্য কোনো দেশ সম্পর্কে জানতেন না? অথচ তার দ্বীনি দাওয়াতের প্রথম পর্যায়েই তার প্রতি ঈমান এনেছিল হাবশার বেলাল, রোমের সুহাইব এবং পারস্যের সালমান। এই সব দেশ তো আরবের বাইরে অবস্থিত। তাছাড়া

কোরআনের বাণী তাঁকে ও তাঁর দাওয়াতকে বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন বানিয়েছে- বানিয়েছে সর্বকালীন। কেননা কুরআন দাবী করেছেঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿89﴾

হে নবী! তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি, তা সব কিছুর ভাষ্যকার, মুসলিমদের জন্য হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ।

(আল নাহলঃ ৮৯)

এই মুসলিম দুনিয়ার যে কোনো মানুষই হতে পারে- হতে পারে ইসলাম কবুল করলেই। প্রথম পর্যায়ে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচারিত দ্বীন সার্বজনীন ও সর্বজাতীয় তথা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সেই পর্যায়ের ইতিহাসই তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে।

সমাপ্ত